গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

দুর্নীতির তদন্তের দাবির সামনে ‘চৌকিদার’ লুকোচ্ছেন কেন

প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ালেন, আমিই সব, আমিই সকলের চেয়ে বড় ইত্যাদি অনেক কিছু বললেন— কিন্তু আসল প্রশ্ন, আদানিদের শেয়ার দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত হবে কি না, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার আদানিদের কী কী সুবিধা দিয়েছে ইত্যাদি কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন না। আসলে তিনি গলার জোর দেখিয়ে পালিয়ে গেলেন। এই প্রধানমন্ত্রীই এক সময় নিজেকে দেশের চৌকিদার বলেছিলেন। আজ দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে সেই চৌকিদারই লুকোচ্ছেন কেন? তিনি যে পালাতে চাইছেন, দেশজোড়া প্রশ্নের মুখে ভয় পেয়েছেন, সংসদে অনর্থক আত্মআস্ফালনই যে তার প্রমাণ— এ কথা দেশবাসী ধরতে পারবেন না, সাধারণ মানুষকে এতটা বোকা কি তিনিও ভাবেন?

আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মার্কিন গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গের আনা শেয়ার দামে কারচুপির অভিযোগ নিয়ে দেশের মানুষ চিন্তিত। স্টেট ব্যাঙ্ক, এলআইসি-র ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ আদানিদের শেয়ারের দাম অর্ধেক হয়ে যাওয়াতেই মিলছে। ফ্রান্সের সংস্থা টোটাল এনার্জিস আদানিদের সঙ্গে তাদের যৌথ হাইড্রোজেন প্রকল্প স্থগিত করে দিয়েছে। ‘নরওয়ে ওয়েলথ ফান্ড’ আদানির পাঁচটি সংস্থায় থাকা তাদের সমস্ত শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলার কথা ঘোষণা করেছে। মর্গান স্ট্যানলি ক্যাপিটাল ইন্টারন্যাশনাল খোলা বাজারে আদানি গোষ্ঠীর বিক্রিযোগ্য শেয়ারের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে বিনিয়োগ এখন মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকির কাজ।

সেবি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিংবা সরকারের অর্থ দফতর সম্পর্কে অভিযোগ যে, আদানিদের রকেট গতির অস্বাভাবিক উত্থান দেখেও তারা এই দীর্ঘ সময় ধরে কিছু না জানার ভান করে থেকেছে। স্বাভাবিক ভাবেই দাবি উঠেছে, হয় যুক্ত পার্লামেন্টারি কমিটির তত্ত্বাবধানে কিংবা সুপ্রিম কোর্টের কোনও বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্ত করে অতি দ্রুত প্রকৃত সত্য প্রকাশ্যে আনা হোক।

এটি যে একটি ন্যায্য দাবি, অন্য কোনও উদ্দেশ্য না থাকলে কারও তা অস্বীকার করার কথা নয়। কারণ আদানি কোনও সাধারণ পুঁজিপতি নন, ধনকুবেরদের তালিকায় এই ঘটনার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতে প্রথম এবং বিশ্বে তৃতীয়। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি, রেল, তেল, গ্যাস, কয়লা, বিমান ও সমুদ্র বন্দর প্রভৃতি বেশির ভাগই যেমন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তেমনই ব্যাঙ্ক এবং এলআইসি থেকে জনগণের সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ অর্থও তাদের শেয়ারে খাটছে। বিজেপি শাসনের গোড়ায় যেটি ছিল

দুয়ের পাতায় দেখুন

একচেটিয়া পুঁজি এবং সরকারের সর্বনাশা চক্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৯ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

মার্কিন গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট আদানি গোষ্ঠীর দুর্নীতি, প্রতারণা এবং সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়টিকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। বিজেপির গত ৮ বছরের শাসনকালে আদানি গোষ্ঠীর উল্কাগতি উত্থান, যা তাকে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনীতম ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল, তার পিছনে কাজ করেছে সরকারের ঢালাও সুবিধা দেওয়া, প্রয়োজনে নীতি বদলে ফেলা এবং কূটনৈতিক সম্পর্ককে ব্যবহার করা, যা দেশের ভিতরে এবং বাইরে আদানিদের নানা ধরনের ব্যবসাকে বাড়াতে সাহায্য করেছে। এই রিপোর্ট গত এক দশক জুড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আদানিদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ককে প্রকাশ্যে এনেছে। রিপোর্ট এটাও প্রমাণ করেছে, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন-পূর্ব স্লোগান ‘না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা’ কতখানি অন্তঃসারশূন্য ছিল। বাস্তবে, বর্তমান সময়ে কোনও রাজনৈতিক দল, তা বিজেপি হোক বা কংগ্রেস কিংবা আঞ্চলিক বা সোসাল ডেমোক্রেটিক দলগুলি, যারাই বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থের সেবাদাস হিসাবে কাজ করবে তারা কেউই দুর্নীতির বাইরে থাকতে পারবে না এবং অসততা ও অনৈতিক কার্যকলাপ তাদের গ্রাস করবে যা শোষিত জনতার মুক্তিসংগ্রামে বাধা হিসাবে কাজ করবে।

আজ জনগণকে এই সত্যটা স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে একচেটিয়া পুঁজি এবং সরকারের দুষ্টচক্র ভারত সহ প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণকে সোচ্চার হতে হবে।

ভুয়োদের চাকরি বাতিল হল

যোগ্যদের নিয়োগ হবে কবে

আদালতে দাঁড়িয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বীকার করেছে স্কুলে ভুয়ো চাকরি দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে ১৯১১ জন গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরি বাতিল করেছে আদালত। ঠিক এই কথাটাই ৭০০ দিন ধরে লাগাতার বলে আসছেন ন্যায্য চাকরি থেকে বঞ্চিত, কিন্তু নাছোড় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অবস্থানকারী হবু শিক্ষকরা। ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁদের অবস্থান আন্দোলন পড়ল ৭০০ দিনে। একটানা এই ধরনা আন্দোলনের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছে।

এর আগেও তাঁরা অবস্থান করেছেন। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে ২৯ দিন ধরে চলা হবু শিক্ষকদের অনশন রাজ্যের মানুষ নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। এরপর ২০২১-এ সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কের ৫ নং গেটের কাছে ফের ১৮৭ দিনের অবস্থান ও অনশন আন্দোলন চালান তাঁরা। সরকার বারবার নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগকে উড়িয়ে দিলেও প্রতিবারই ভোটের জন্য আন্দোলনকারীদের মঞ্চে গিয়ে কি মুখ্যমন্ত্রী কি শিক্ষামন্ত্রী সকলেই মেধা তালিকাভুক্তদের নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কথা রাখেননি। উল্টে আন্দোলনকারী নেতাদের র‍্যাঙ্ক জাম্প করিয়ে চাকরি পাইয়ে দিয়ে আন্দোলন ভাঙতে চেয়েছেন।

তাই ২০২১-এর ৮ অক্টোবর থেকে ধর্মতলার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরনায় যাঁরা বসেছেন তাঁরা আর সেই ভুল করেননি। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সমস্যা

তিনের পাতায় দেখুন

এই দুর্নীতির দায় রাজ্য সরকারের

এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, এসএসসি যখন আদালতে নিজেই স্বীকার করেছে যে, ৮০০ জন শিক্ষকের প্রায় ৫৩ নম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে বেআইনি নিয়োগ করেছে এবং স্কুলে গ্রুপ ডি কর্মীদের ক্ষেত্রে ২৮২০ জনের উত্তরপত্রে (ওএমআর শিট) কারচুপি করেছে তখন এসএসসি এখনই তাদের চাকরি বাতিল করুক। সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য প্রার্থীরা যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় অবস্থান করছেন তাঁদের অবিলম্বে চাকরি দেওয়া হোক। আমাদের আরও দাবি, বেআইনিভাবে যাঁরা এতদিন চাকরি করেছেন তাঁদের বেতনের টাকা অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা হোক।

৭০০তম দিনে আন্দোলনের মঞ্চে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য তরুণ মণ্ডল

এসএসসি-তে এত বড়ো দুর্নীতির দায় রাজ্য সরকার এড়াতে পারে না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের নেতারা প্রত্যেকদিন তাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দুর্নীতির শিকড় কতটা গভীরে তা যথাযথভাবে তদন্ত করে দ্রুত সত্য উদ্ঘাটনের দাবি জানাচ্ছি।

চৌকিদার লুকোচ্ছেন কেন

একের পাতার পর

একটি সাধারণ ব্যবসায়িক সংস্থা, গত এক দশকেই রকেট গতিতে তা কী করে দেশের এক নম্বরে পরিণত হল, দেশের মানুষের কাছে তা এক গভীর রহস্য হিসাবেই রয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তদন্তের মধ্য দিয়ে সেই রহস্যের উন্মোচন দেশের মানুষের কাছে সরকার তথা প্রশাসনের স্বচ্ছতা প্রমাণের জন্যই প্রয়োজন। অথচ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যাঁরা বিনামূল্যে রেশন, শৌচালয়, আবাস প্রভৃতি পেয়েছেন, তাঁরা কি এই মিথ্যে, নোংরা অভিযোগ, গালিগালাজে বিশ্বাস করবেন? বলেছেন, মোদি দেশের ২৫ কোটি পরিবারের সদস্য। মোদি দুঃসময়ে তাঁদের পাশে থেকেছে। দেশের ১৪০ কোটি মানুষের আশীর্বাদ সুরক্ষা কবচের মতো মোদির সঙ্গে রয়েছে।

রেশন, শৌচালয় কিংবা নলবাহিত জলের ব্যবস্থা করা যে কোনও সরকারের ন্যূনতম কর্তব্য। তার সঙ্গে আদানিদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির তদন্ত করা না করার কী সম্পর্ক? প্রশ্নটা তো এখানে আদানিদের দুর্নীতি এবং সেই দুর্নীতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি সরকারের যোগসাজশ নিয়ে—দেশের মানুষের জন্য সরকার কী করেছে না করেছে তা নিয়ে নয়। প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তা অভিযোগের উত্তরে অবান্তর কথা বলে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই চেষ্টাতেই লোকসভা এবং রাজ্যসভায় তিনি কংগ্রেস সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু কংগ্রেস দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বৈরতান্ত্রিক, ইতিহাসের বিকৃতির জনক বলে তাঁরও একই আচরণ করার অধিকার আছে, এটা কী রকম যুক্তি? কংগ্রেসের অপকীর্তির সাথে আদানিদের বিরুদ্ধে ওঠা বিরাট দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত না করার কী সম্পর্ক?

তবে কি প্রধানমন্ত্রী আশঙ্কা করছেন যে তদন্ত হলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়বে? গত এক দশকের অভিজ্ঞতায় দেশের মানুষ জানেন, রকেট গতিতে আদানিদের দেশের এক নম্বর পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়ার পিছনে এক সময়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং তারপর দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৌতম আদানি নিজেও কিছু দিন আগে এক স্বাক্ষাৎকারে মোদিজির মুখ্যমন্ত্রীত্বকে তাঁর জীবনের বড় টার্নিং পয়েন্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিশ্বে ধনীদের তালিকায় আদানি ২০১৪ থেকে ২০২২-র মধ্যে ৬০৯ থেকে ৩ নম্বরে পৌঁছে গেছেন। ক'দিন আগে আদানিদের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যখন মৌনব্রত নিয়ে চলছিলেন এবং উত্তর দেওয়ার জন্য অর্থমন্ত্রীকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, তখন অর্থমন্ত্রী সরকারকে আড়াল করতে বলেছিলেন, আদানিদের শেয়ার কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত বিষয়টি সেবি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক্তিয়ার, এর সাথে সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতারা কি দেশের মানুষকে বোকা ভেবে নিয়েছেন? হয়তো তাই, না হলে এত কাঁচা কথা তাঁরা বলতেন না।

পাইকারি হারে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো যে আদানিদের হাতে তুলে দেওয়া হল, প্রাকৃতিক সব সম্পদ যে নির্বিচারে তারা দখল নিচ্ছে, এ সব যেন সরকারের সম্মতি ছাড়াই আপনাআপনি হয়ে গেল? অস্ট্রেলিয়ায় আদানিদের কয়লা খনি কেনার জন্য স্টেট ব্যাঙ্কের থেকে ৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করতে স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানকে যে জরুরি তলব করে অস্ট্রেলিয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা কি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়াই? তা-ই যদি হয়, তবে তো বলতে হয়, সরকার নয়, স্টেট ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে আদানিই। প্রধানমন্ত্রী কি তা মানতে রাজি আছেন? দেশে আগামী বহু বছরের প্রয়োজন মেটানোর মতো কয়লা মজুত থাকা সত্ত্বেও যে প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাকে অন্তত ১০ শতাংশ কয়লা অনেক বেশি দামে বিদেশ থেকে আমদানি করার নির্দেশ সরকার জারি করেছিল, তার কারণ কি অস্ট্রেলিয়ায় আদানিদের খনি থেকে উৎপাদিত কয়লা সরকারের বকলমে দেশের মানুষকে গছিয়ে দেওয়া ছিল না? ২০২২-এর জুনে যখন শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষ সে দেশের চরম দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল, তখন যে সে দেশের বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রকাশ্য শুনানিতে বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতি রাজাপক্ষে তাঁকে বলেছেন, আদানিকে সরাসরি প্রকল্প দিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে চাপ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রায় প্রতিটি বিদেশ সফরের সঙ্গী হয়েছেন আদানি। সফর শেষেই সেই দেশগুলির সঙ্গে আদানিদের বিরাট বিরাট ব্যবসায়িক চুক্তিগুলি কি সেই সফরের ফল নয়? তা সে বাংলাদেশের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিক্রির চুক্তি হোক কিংবা ইজরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি। সমুদ্র ও বিমান বন্দর, গ্রিন এনার্জি, হাইওয়ে প্রভৃতি একের পর এক দেশের সম্পদ যে বিজেপি সরকার আদানির হাতে তুলে দিয়েছে তা কি কোন সরকারি নীতি বা পরিকল্পনা ছাড়াই? অর্থ দপ্তর এবং নীতি আয়োগের আপত্তি সত্ত্বেও যে দেশের ছটি বিমানবন্দর কোনও রকম পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন আদানিদের হাতে তুলে দেওয়া হল, তা কার নির্দেশে?

প্রধানমন্ত্রী হয়তো ভাবছেন, তদন্ত একবার শুরু করে দিলে তা আপন গতিতে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা তিনিও জানেন না। তদন্তে সরকারের ভূমিকা, প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা উঠে আসবে। স্টেট ব্যাঙ্ক সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এবং এলআইসি কার নির্দেশে আদানিদের শেয়ার অনেক বেশি দামে কিনেছিল, শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদি কী ভাবে চাপ দিয়েছিলেন কিংবা আদানিদের এতখানি 'উপকারের' বিনিময়ে বিজেপি কী ভাবে উপকৃত হয়েছে, বিজেপি নেতারা কার চার্টার্ড বিমানে চেপে সফর করেন, ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে আদানিরা বিজেপিকে কত টাকা দিয়েছে, অন্য ভাবেই বা কত টাকা দিয়েছে, তদন্তে এ সবই উঠে আসতে পারে। প্রধানমন্ত্রী কি এই ভয়েই তদন্ত এড়িয়ে যাচ্ছেন? কিন্তু তদন্ত এড়িয়ে তো আসলে তিনি দেশের মানুষের অভিযোগকেই মেনে নিচ্ছেন।

তদন্ত এড়াতে প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের কাছে যে আবদার করেছেন তাকে অদ্ভুতই বলতে হয়। তিনি বলেছেন, হে দেশবাসী, তোমাদের আমি রেশনে চাল দিয়েছি। অতএব তোমরা আমার অন্যায়ের প্রতি চোখ বুজে থাকো আর চাল চেবাও। দেশের মানুষ সরকারের থেকে যা পাচ্ছেন, তা কারও দয়ার দান নয়— না কোনও দলের, না কোনও মন্ত্রীর। জনগণের করের টাকার একটা অতি সামান্য ভগ্নাংশই সরকারগুলি এ ভাবে তাঁদের জীবনের সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের পরিবর্তে দান বা দয়া হিসাবে ছুঁড়ে দেয়। আর সেই করের বেশির ভাগটাই সরকার তুলে দেয় দেশের পুঁজিপতিদের ভাণ্ডারে। তাই লকডাউনের সময়ে যখন লাখে লাখে মানুষ অতিমারির শিকার হয়েছেন, হাজারে হাজারে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিয়েছেন, কয়েক কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন, কোটি কোটি মানুষ অর্ধেক বা তারও কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন, তখন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা কারও ২০০ গুণ, কারও ৩০০ গুণ করে বেড়েছে। কয়েক শো নতুন ধনকুবেরের জন্ম হয়েছে। এই সময়ের তিন বছরেই আদানিরা তাঁদের বিপুল সম্পদের ৮৫ শতাংশই জমা করেছে। আর আজ প্রধানমন্ত্রী সামান্য খুদকুঁড়োর বিনিময়ে একটা বিরাট দুর্নীতিকে, একটা ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কারিকে বিনা প্রশ্নে দেশের মানুষকে মেনে নিতে বলছেন। 'না খাউঙ্গ, না খানে দুঙ্গা' বলে ঠিক উল্টোটাই তিনি করেছেন না কি? এই দুষ্কর্মের ভার তাঁকেই বইতে হবে, জনগণ বইবে না। যদি সত্যিই সরকার কিংবা প্রধানমন্ত্রীর এতে কোনও সংস্রব না থাকে তবে তদন্তের মাধ্যমেই তিনি তা প্রমাণ করুন।

দেশের মানুষকে আজ এ কথাটি খুব স্পষ্ট ভাবে বুঝতে হবে যে, ভারত চরিত্রগত ভাবে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু কালের নিয়মে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ আজ পচে গিয়েছে। দুর্নীতি, অর্থাৎ জনগণের সম্পত্তি, দেশের সম্পদ বেআইনি ভাবে লুঠ করা, সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে সেগুলি হাতিয়ে নেওয়া এই ব্যবস্থার অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে। আজ যে দল বা যে নেতা-ই ক্ষমতায় বসে পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থার সেবা করবে, নানা কথার ছলে এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে, সেই দল, সেই নেতা দুর্নীতির অংশীদার হবেই। পুঁজিপতিদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলি, তার নেতারা আজ দুর্নীতির সম্পর্কেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কেউ কেউ একে স্যাঙাৎতন্ত্র বলেন। আসলে আজ পুঁজিবাদের এটাই স্বরূপ। আদানিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি আজ সেই সম্পর্কেই জড়িত। মোদির মতো নেতারা পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে। তারা যত রকম বৈধ-অবৈধ উপায়ে পুঁজিপতিদের সুবিধা পাইয়ে দেন। তাদের পুঁজির পরিমাণ বাড়তে থাকে। বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট দল বা নেতা পেয়ে যায় মসনদে স্থায়ী ভাবে বসার অনুমোদন। তার জন্য অর্থ, প্রচার প্রভৃতি যা কিছু লাগে তা জোগায় সুবিধাভোগী পুঁজিপতিরা। আর এই ম্যানেজার দেশের মানুষকে বোঝায়, দেখো, দেশের কত উন্নতি হচ্ছে। দেখো, আমাদের দেশেরই একজন বিশ্বে তৃতীয় ধনবানের আসন দখল করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে। বুভুক্ষু জনতা চোখ কচলে সে দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে, আমার বেকারি, আমার বিনা চিকিৎসায় ভোগা, আমার অনাহার— এগুলো কি তা হলে শুধুই মায়া? নেতা বলেন, এ সবই তোমার অপদার্থতা। পরিশ্রম কর, তুমিও একদিন পারবে। বছরের পর বছর ধরে এ-ই চলে আসছে।

আজ এ কথাটিও নিঃসংশয়ে বুঝতে হবে, সরকারের এই যথেচ্ছ দুর্নীতি আটকাতে হলে, তার সর্বনাশা পরিণতি থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে হলে আজ শুধুমাত্র একটি সরকার বদলে আর একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসালেই তা হবে না। চরম দুর্নীতিগ্রস্ত বলে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারকে সরিয়ে দেশের মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। তার পরিণতি মানুষ দেখতে পাচ্ছে। এ রাজ্যে সিপিএম সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপোষণে অতিষ্ঠ মানুষ তাদের সরিয়ে তৃণমূলকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। তারও পরিণতি আজ স্পষ্ট। এই অবস্থায় দুর্নীতি-শোষণ-লুণ্ঠনের হাত থেকে কিছুটাও রেহাই পেতে হলে স্তরে স্তরে জনগণের সংগ্রামী কমিটির নেতৃত্বে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলে সরকার ও প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ভাবে জনগণ তথা শোষিত মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি নিয়ে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলে তার আঘাতে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া যেমন দুর্নীতির স্থায়ী অবসান হবে না, তেমনই মানুষও শোষণ, বঞ্চনা, লুণ্ঠনের হাত থেকে রেহাই পাবে না।

যে কোনও বড় আদর্শের মর্মবস্তু তার সংস্কৃতি ও রুচিগত মানের মধ্যে নিহিত থাকে

শিবদাস ঘোষ

"নৈতিকতার সংকটের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। এ কথা ঠিক যে, দেশে খাদ্য সংকট তীব্র হচ্ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না, বেকার সমস্যা বাড়ছে, বিদ্যুৎ নেই— এই সমস্ত সমস্যায় আমরা ঘরে ঘরে ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় ক্ষতি, নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এবং যুক্তিহীন মানসিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমাজজীবনে যে সমস্যা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে, সেখানে ঘটছে। মনে রাখা দরকার, অভাব এবং অত্যাচারের তাড়না যতই হোক না কেন তার দ্বারা একটা জাতিকে মেরে ফেলা যায় না। ব্রিটিশরা দুশো বছরের উপর আমাদের পদানত করে রেখেছিল। কিন্তু, গোটা জাতিটাকে মারতে পারেনি। ভিয়েতনামকে বোমা মেরে মেরে আমেরিকা মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে এবং সেখানকার মানুষগুলোকে একেবারে মাটির তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গোটা দেশের, জাতির মেরুদণ্ড ভাঙতে পারেনি। কিন্তু, আমাদের দেশের শাসক সম্প্রদায় আজ দেশে কি শুধু অর্থনৈতিক দুর্দশাই সৃষ্টি করছে? যে যুক্তি দ্বারা তারা নিজেদের অন্যায় আচরণকে সমর্থন করছে, লোককে সমর্থন করতে বলছেন, পুলিশ যে ভাবে প্রকাশ্যেই প্রতিদিন আইনকে পদদলিত করে চলেছে, এবং পুলিশের এইসব আচরণকে রাজনৈতিক নেতারা এবং প্রশাসকরা যেভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন; উপরন্তু, যুক্তিহীন মানসিকতা যদি এমন স্তরে পৌঁছে থাকে যে, দেশের তরুণরাও কোনও কিছু বুঝতে না চান, রাস্তাঘাটে অশালীন আচরণ করেন এবং তা দেখে বয়স্করাও চুপ করে থাকেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অপরের মতামত সম্বন্ধে সহনশীলতার এরূপ অভাব ঘটে থাকে, তা হলে কী প্রমাণ হয়? শুধু আমরা খেতে পাচ্ছি না এবং আমাদের অভাব— এইটেই প্রমাণ হয়? নাকি, এটাও প্রমাণ হয় যে, আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে? মনে রাখবেন, একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেতে পেলেও সে লড়ে যদি মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ বলতে দেশে আর বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ, মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে বাধা সৃষ্টি করে। ...

... আমি বলেছিলাম, যে কোনও বড় আদর্শের মর্মবস্তু তার সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের মধ্যে নিহিত থাকে। সংস্কৃতিগত এবং রুচিগত মান যদি উঁচু না থাকে, তা হলে যেকোনও একটি উঁচুদরের রাজনৈতিক আদর্শের ধাঁচাটা একটা প্রাণহীন দেহের মতো হয়ে যায়। একটা শরীর দেখতে খুব সুন্দর হলেও যদি তার প্রাণ না থাকে তা হলে তা যেমন অকার্যকরী, ফেলে রেখে দিলে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, তেমনি কেউ কোনও একটা বড় আদর্শের কথা বলেও যদি উন্নত রুচি এবং সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত না করে তা হলে সেটাও ঠিক সেই রকম সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং পচনশীল।

কাজেই কোনও একটা পার্টি আদর্শের বড় বড় কথা বলছে কি না সেটা বড় কথা নয়। তাদের আদর্শ সত্যিই বড় কি না তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে, তাদের নেতা, কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ ব্যক্তিগত জীবনে, প্রতিদিনের ব্যবহারে ও রাজনৈতিক আচার-আচরণে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছে কি না।"

ফ্যাসিবাদ ও বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নৈতিকতার সংকট
রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড

ভুয়োদের চাকরি বাতিল হল, যোগ্যদের নিয়োগ হবে কবে

একের পাতার পর

সমাধানের প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও আন্দোলন তাঁরা প্রত্যাহার করেননি। ৭০০ দিন ধরে চলা আন্দোলনে সংহতি জানাতে ১২ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আন্দোলন মঞ্চে যান। তাঁরা আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানান।

রাস্তার আন্দোলনের পাশাপাশি দাবি আদায়ের পরিপূরক হিসাবে চলেছে আদালতে কড়া নাড়া। প্রতিদিন সকাল থেকে বিকাল পাঁচটা রোদ-ঝড়-বৃষ্টি-শীত সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে চলেছে তাদের লড়াই। প্রচলিত সংবাদমাধ্যম প্রথমে উদাসীন থাকলেও শিক্ষকতার চাকরির ন্যায্য দাবিদার আন্দোলকারীরা তাতে দমে যাননি। বরং তাদের বলিষ্ঠতা, সংগ্রামী মানসিকতা দৃঢ় হয়েছে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকা হার না মানা এই লড়াই-ই বাধ্য করেছে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক দলসহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা বুঝতে। এ ভাবেই শুধুমাত্র রাস্তায় বসে থেকে এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে এক প্রবল জনসমর্থন। আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই এস ইউ সি আই (সি) দল ও যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও এই আন্দোলনের পাশে থেকেছে। আদালত বারবার তদন্তকারী সংস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে, অফিসার বদল করেছে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা হতাশ হননি। তাঁদের এই দৃঢ়চিত্ততা, শেষ দেখে ছাড়ার মানসিকতা সকল পক্ষকে বাধ্য করেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। আন্দোলন যত ছড়িয়েছে, সরকার ও স্বার্থান্বেষী বিরোধী পক্ষের চক্রান্ত উন্মোচিত করে আন্দোলন যত গড়ে উঠেছে, ততই চাপ সৃষ্টি হয়েছে সরকার ও পার্লামেন্টারি বিরোধীপক্ষ সহ সকলের উপর। আর সেই চাপেই একের পর দুর্নীতি প্রকাশিত হয়ে পড়ছে।

এই আন্দোলনের চাপেই অবশেষে বাঁকা পথে নিয়োগের কথা মানতে বাধ্য হল রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। আদালতে হলফনামা দিয়ে কার্যত রাজ্য সরকার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির কথা কবুল করেছে। এর ফলে নবম দশম শ্রেণির শিক্ষক পদে চাকরি খোয়াতে চলেছেন ৮০৩ জন। চাকরি হারাতে বসেছেন বিভিন্ন স্কুলের গ্রুপ ডি বা চতুর্থ শ্রেণির ২৮২০ টি পদে নিযুক্তরাও। ইতিমধ্যে ১৯১১ জন গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যাদের নিয়োগ বাতিল হল তারা আদালতে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ না করে আর কোনও দিন চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারবেন না এবং এদের প্রত্যেককে প্রাপ্ত বেতনের টাকা ফেরত দিতে হবে। সিবিআই এদের তদন্তের আওতায় আনবে, প্রয়োজনে তাদের হেফাজতেও নিতে পারবে। এই সব শূন্যপদে ওয়েটিং লিস্টে থাকা পদপ্রার্থীদের মেধা তালিকা থেকে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি যাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়, এর আগেও হয়েছে। কিন্তু এই দুর্নীতির বহর কতখানি? জানলে অবাক হতে হয়। গ্রুপ ডি-র ঘোষিত শূন্য পদ ছিল ৩৯৫৬ টি। এর মধ্যে ২৮২০ পদেই চাকরি পেয়েছে ভুয়ো প্রার্থীরা। ইতিমধ্যে দুই খেপে ২৫২৮ জনের চাকরি বাতিল হয়ে গেছে। ওএমআর শিট কারচুপি করেই হয়েছে এই নিয়োগ। শুধুমাত্র মেধা তালিকায় নয়, ওয়েটিং লিস্টেও কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। এনওয়াইএসএ সংস্থাকে এসএসসি নিয়োগ করেছিল ওএমআর শিট মূল্যায়নের জন্য। দেখা গেছে তাদের সার্ভারে প্রাপ্ত নম্বর আর এসএসসির সার্ভারে প্রাপ্ত নম্বরে বিস্তর গরমিল। এনওয়াইএসএ-র সার্ভারে প্রাপ্ত নম্বর শূন্য, এইরকম অনেক প্রার্থী এসএসসির সার্ভারে অনায়াসে ৫৭, ৫৩, ৫৮ নম্বর পেয়ে উপরের দিকে র‍্যাঙ্ক করেছে। যাদের চাকরি গেছে, দেখা যাচ্ছে তাদের বেশিরভাগই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মী বা মন্ত্রীদের ঘরের লোকজন।

প্রবল চাপের মুখে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্ররা সেই পুরনো কথাই শোনাচ্ছেন— আইন আইনের পথে চলবে। কেউ কেউ বলছেন ভোটের জন্য বিরোধীরা নাকি ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, চাকরিই তো গিয়েছে, ব্যাপমের মত খুন তো হয়নি। এ কথা ঠিক, ভোটবাজ কিছু দল ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। বিগত সিপিএম শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও খাদ্য দপ্তরের নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ হয়েছে। পাশের রাজ্য ত্রিপুরায় বিগত সিপিএম সরকারের আমলে বাঁকা পথে চাকরি পাওয়ার জন্য ১০ হাজারের বেশি শিক্ষকের চাকরি হাইকোর্ট বাতিল করেছে। মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট সহ বিজেপি শাসিত ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে আরও ব্যাপকভাবে নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান অনাচারের, অপরাধের মাত্রা কোনও অংশে কমে না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে হবু শিক্ষকদের এই আন্দোলন সঙঘবদ্ধ ভাবে যে লড়াই গড়ে তুলতে পেরেছে তাতে আজ তাঁরা দাবি আদায়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। এটাই সঙঘবদ্ধ জনতার শক্তি। খুব সম্প্রতি দিল্লির বুকে দেশের কৃষক সমাজের এমনই এক শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি, যা কেন্দ্রের প্রবল শক্তিশালী সরকার তো বটেই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করেও অনড় লড়াই চালিয়ে দাবি আদায় করেছে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলি দেশসেবার নামে আত্মসেবা আর দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার নামে কতিপয় পুঁজিপতি ও তার তোষামোদকারী আর নিজেদের আত্মীয় পরিবার-পরিজনদের স্বার্থ রক্ষা করছে।

বিপরীতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে অন্যায়, অত্যাচার, বঞ্চনার, দারিদ্রের অতল গহ্বরে। প্রচলিত এই বুর্জোয়া ব্যবস্থায় প্রশাসন এমনকি বিচারব্যবস্থাও ক্রমাগত শক্তি দেয় অত্যাচারী পুঁজি-মালিকদের আর জনগণকে করে শক্তিহীন। প্রতিদিন জনগণের অধিকারগুলিকে তারা কেড়ে নিতে উদ্যত। একে যদি রুখতে হয়, নিজেদের অধিকারগুলোকে যদি রক্ষা করতে হয়, বেঁচে থাকার ন্যূনতম দাবি যদি আদায় করতে হয়— তা হলে প্রয়োজন শোষিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গড়ে তোলা। যা এক বিকল্প শক্তির জন্ম দেবে, যে শক্তিকে ভয় পায় সকল শাসক। এই শক্তির জোরেই জনগণ দীর্ঘ ১৯ বছর লড়াই করে প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, দিল্লির কৃষক আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পেরেছে। বর্তমান হবু শিক্ষকদের আন্দোলন এই শক্তির জোরেই দাবি আদায়ের পথে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে। ভোটে সরকার পরিবর্তনের রাজনীতি নয়, জনগণের এই বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যভবনে আশা কর্মীদের ডেপুটেশনে পুলিশের বাধা

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের (এনআরএইচএম) খাতে গত বছরের তুলনায় বরাদ্দ কমানো হয়েছে। আশাকর্মীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকার আশাকর্মীদের কাজের জন্য গাল ভরা খেতাব দিলেও বেঁচে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থা করছে না। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বাজেটে আশাকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বাড়িয়ে ফিক্সড ভাতা বৃদ্ধি করা, সময় মতো পারিশ্রমিক দেওয়া ইত্যাদি দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন ৭ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় এবং দক্ষিণবঙ্গে সল্টলেক স্বাস্থ্যভবনে ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেয়। স্বাস্থ্যভবনে কর্মসূচি শুরুর আগেই পুলিশ বাধা দেয়। প্রবল ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য কয়েক হাজার আশাকর্মী উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ অতর্কিতে কর্মীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মারধর করে। এই ঘটনায় তিনজন আশা কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরে আশাকর্মীরা সেখানেই বিক্ষোভ দেখান ও স্বাস্থ্য অধিকর্তার হাতে দাবিপত্র তুলে দেন। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ৮ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যে আশাকর্মীরা কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ দিবস পালন করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক এবং মার্চ মাসে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটি বয়কট করে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

সল্ট লেক স্বাস্থ্যভবনে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

এ রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কর্মরত প্রায় ৬০ হাজার আশা কর্মী প্রসূতি মা, শিশু এবং গ্রামীণ জনসাধারণকে রাত দিন স্বাস্থ্য পরিষেবা দেন। বর্তমানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেই কাজের পরিধিও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। মা-শিশুর পরিষেবা দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও এই কাজের জন্য আশা কর্মীদের সম্মানজনক পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। আবার বহু ক্ষেত্রে পরিষেবা দিলেও পারিশ্রমিক পাওয়া অনিশ্চিত থাকে। এখন বিপর্যয় মোকাবিলা, খেলা-মেলা-ভোটের ডিউটি, দুয়ারে সরকার, জল পরীক্ষা, নুন পরীক্ষা, স্কুল কলেজ পরীক্ষায় ডিউটির জন্য গেটে গিয়ে অবাঞ্ছিতের মতো বসে থাকা, নির্মল বাংলা, খোলা-শৌচমুক্ত বাংলা, শৌচালয় সার্ভে, আবাস যোজনার সার্ভে, এরকম বহু প্রকল্পের কাজও তাঁদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে করানো হয়। এঁরা সেই কর্মী যাঁরা করোনার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে রাতদিন আক্রান্ত মানুষকে পরিষেবা দিয়েছেন। নিজেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, কারও কারও মৃত্যুও হয়েছে। আবাস যোজনার সমীক্ষার মতো কাজ করতে গিয়ে ঘর পুড়েছে, মরতে হয়েছে।

সরকারের নানা উৎসব-বিনোদনে, নানা প্রকল্পের সার্ভের কাজে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও এই সমস্ত ডিউটিতে আশা কর্মীদের জন্য কোনও পারিশ্রমিক বরাদ্দ করা হয় না। উপরন্তু জোর করে নানা রকমের ভয়-ভীতি দেখিয়ে কাজগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়। বহু কাজ জীবনের ঝুঁকি নিয়েও করতে হয়। এর বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে জুটেছে চরম অবজ্ঞা ও অবহেলা।

২৯ জানুয়ারি উলুবেড়িয়া হাইস্কুলে হাওড়া গ্রামীণ জেলা আশাকর্মী ইউনিয়নের ২য় সম্মেলন। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন

পাঁশকুড়া বিডিও অফিস ডেপুটেশন

৮ ফেব্রুয়ারি পাঁশকুড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (সি)। দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়— আবাস যোজনার দুর্নীতি দূর করে প্রকৃত প্রাপকদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে, জব-কার্ডহোল্ডারদের ১০০ দিনের কাজ ও বকেয়া টাকা দিতে হবে, ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের বেহাল রাস্তা মেরামত ও নিকাশি খালগুলির সংস্কার করতে হবে।

প্রকাশিত হয়েছে, সংগ্রহ করুন

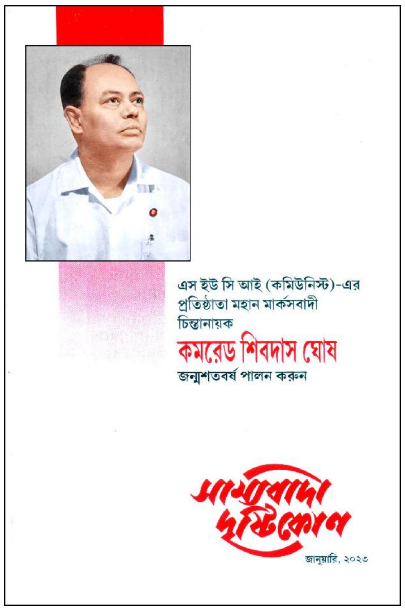

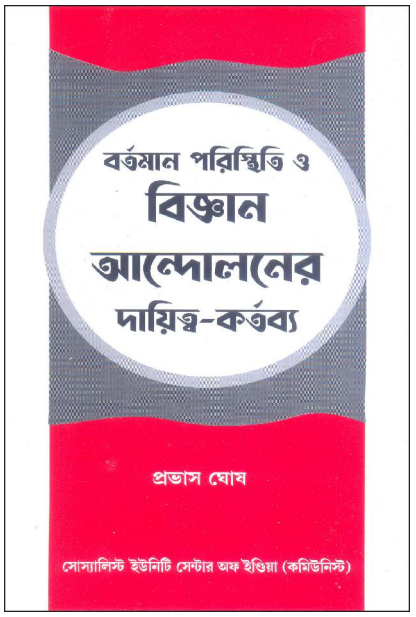

পানচাষিদের দীর্ঘ আন্দোলনের জয়

৭ ফেব্রুয়ারি কাকদ্বীপ এসডিও অফিসে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে পানচাষিদের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দাবি আদায় হল। চাষের উপকরণ সার, কীটনাশক, বিভিন্ন রাসায়নিক ওষুধের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। উৎপাদিত পণ্য বিক্রির প্রাইভেট বাজারগুলিতে পাইকারি ক্রেতা ও কমিশনভোগী আড়তদারদের মিলিত অসাধুচক্রের ফাঁদে পড়ে চাষিদের অবস্থা সঙ্গিন। চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে ৫০টি পান পাতায় গুছির বদলে বাংলা পানে ১৫০-২০০ এবং মিঠাপানে ২৫০-৪০০ পর্যন্ত পানপাতা দিতে চাষিদের বাধ্য করা হচ্ছিল। অন্য দিকে নিলামে ওঠা দরের ২০ থেকে ৪৫ শতাংশ বাদ দিয়ে চাষিকে দেওয়া হচ্ছিল। চাষির তৈরি পানের বান্ডিল (মোট) থেকে ১-২ গুছি কমিয়ে দেওয়াটাই যেন বাজারগুলির নিয়ম। মোট পিছু ১০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বাজার কর্মচারীদের নজরানা না দিলে দাম কম দেওয়ার হুমকি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পানের পাইকারি বাজারে ৯ শতাংশ কমিশন চালু আছে। অন্য ফসলে যা ৫ শতাংশ।

কাকদ্বীপ এসডিও অফিসের সামনে পানচাষি নেতৃবৃন্দ

এর বিরুদ্ধে পানচাষিরা ক্ষুব্ধ। ২০১৭-র নভেম্বরে পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়ি পান বাজারে চাষিদের বিক্ষোভের ঢেউ এসে পৌঁছয় কাকদ্বীপ মহকুমার পানবাজারগুলিতে। সারা বাংলা পানচাষি সমিতির নেতা চিত্তরঞ্জন জানা, কার্তিক দাস, নির্মল জানা, নারায়ণ দাস বিভিন্ন এলাকায় চাষিদের ঐক্যবদ্ধ করে সঠিক পথে আন্দোলন গড়ে তুলতে স্থানীয় চাষি কমিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন।

২০১৮-র ১৪ ফেব্রুয়ারি এক কনভেনশনের মাধ্যমে পান চাষিদের সংগঠন—কাকদ্বীপ মহকুমা পান চাষি সমিতি তৈরি হয়। পরে পরিবর্তিত হয় সারা বাংলা পানচাষি সমিতিতে। যদিও কিছু সুবিধাবাদী নেতা হঠকারী পদক্ষেপ নেওয়ায় চাষিদের বিভ্রান্তির সুযোগে ব্যাবসায়ী আড়তদাররা পোষা গুন্ডা দিয়ে আন্দোলনের নেতাদের আক্রমণ করে, তেমনই পাশাপাশি দালাল সংগঠন গড়ে তোলে। আড়তদাররা সংগঠনের নেতাদের পুলিশ কেসে জড়িয়ে দেয়।

তবুও কুলপি ও কাকদ্বীপ ব্লকে গড়ে ওঠে পানচাষি সুরক্ষা সমিতি। এ ক্ষেত্রে ছাইপউদ্দিন পাইক, ফকিরচাঁদ মোল্লা, চূড়ামণি মণ্ডল প্রমুখ নেতাদের প্রশংসনীয় ভূমিকা এই সফল আন্দোলনে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। এই সমিতি পরবর্তীকালে সারা বাংলা পানচাষি সমিতির সাথে যুক্ত হয় এবং ৩০ জানুয়ারি কাকদ্বীপ মহকুমা শাসককে জানায়, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে ওই দিন এসডিও অফিসে হাজার হাজার চাষি ধর্নায় বসবেন। প্রশাসন বাধ্য হয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি সমাধান সভার আহ্বান করে।

সারাবাংলা পানচাষি সমিতি নভেম্বর মাস থেকে এসডিও, ডিএম, কৃষিবিপণন দপ্তর, হর্টিকালচার দপ্তর এবং মন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত দাবি পত্র দিয়েছে। তারা এলাকায় এলাকায় সভা করে সংগঠন ও শক্তিশালী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। আড়তদাররা দালালদের নামিয়ে আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এসডিও-র সাথে বৈঠকেও তারা দালালদের ঢোকায়। কিন্তু সারা বাংলা পানচাষি সমিতির নেতা ও চাষিদের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে সব অপকৌশল বানচাল হয়ে যায়।

অবশেষে প্রশাসন ঘোষণা করতে বাধ্য হয় ৫০ পান পাতায় গুছি ধরতে হবে, নিলামের ঘোষিত মূল্যের সবটাই দিতে হবে চাষিকে, আড়ত কমিশন ৯ শতাংশ বাতিল করে গ্রহণযোগ্য পরিমাণ ধার্য করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত আগামী ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে বলে ঠিক হয়। আন্দোলনের এই জয়ে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের অন্যতম শরিক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক নারায়ণ হালদার আন্দোলনকারী চাষি ও নেতৃত্বকারী সংগঠনকে অভিনন্দন জানান।

বিদ্যুৎ ভবনে তুমুল গ্রাহক বিক্ষোভ

৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনের মূল গেট অবরোধ করে তিন ঘণ্টা ধরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন। তাঁদের অভিযোগ বহু জায়গায় বাঁশের খুঁটিতে তার বেঁধে বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে রাজ্য সরকারি সংস্থা রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি (এসইডিসিএল)। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র ডাকে ওইদিন তাঁরা এসেছিলেন বণ্টন কোম্পানির চেয়ারম্যানের কাছে ১২ দফা দাবি পেশ করতে।

গ্রাহকদের অভিযোগ, রাজ্যের ২৩টির মধ্যে ১১টি জেলার হিসাব ধরলেই প্রায় ৭ লক্ষাধিক মিটার বন্ধ অথবা খারাপ। দীর্ঘদিন ধরে ওই মিটারগুলি পরিবর্তন না করে গ্রাহকদের কাছে থেকে গড় বিলের নামে বাড়তি টাকা নেওয়া চলছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার প্রায় ৫ হাজার কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহককে বাঁশের খুঁটি পুতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। বহু এলাকায় গৃহস্থ গ্রাহকদেরও বাঁশের খুঁটিতে তার খাটিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। শত শত গ্রাহকদের কাছে থেকে নতুন সংযোগের কোটেশনের টাকা নিয়েও বিদ্যুৎ সংযোগ সময় মতো না দিয়ে ফেলে রাখা চলছেই।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্য সরকার মনোনীত ওমবুডসম্যানের আদেশ হাতে নিয়ে গ্রাহকরা এ অফিস ও অফিস ঘুরছেন, কিন্তু কোম্পানি সে আদেশ কার্যকর করছে না। নির্ধারিত পরিষেবা না দেওয়ার কারণে ওমবুডসম্যান গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণের আদেশ দিলেও কোম্পানি তা দেয়নি। এই নিয়ে মামলায় বণ্টন কোম্পানি হাইকোর্টে পরাজিত হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা না দেওয়ায় আদালতে কোম্পানির ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে। তবুও তারা টাকা দিতে গ্রাহকদের হয়রানি করে চলেছে। কোম্পানির অনেক কাস্টমার কেয়ার সেন্টার গ্রাহকদের অভিযোগপত্র পর্যন্ত গ্রহণ করে না। সম্প্রতি দুয়ারে সরকার প্রকল্পে গ্রাহকদের কাছে থেকে টাকা জমা নিয়েও নতুন কানেকশন বা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নদের পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ করে দেওয়া হয়নি।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার গ্রাহক স্বার্থবিরোধী স্মার্ট বা প্রিপেড মিটার লাগানোর তোড়জোড় করছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের বরাদ্দ যোগ করে রাজ্যে ৩৭ লক্ষ স্মার্ট মিটার কেনা হয়েছে। যে সরকার রাজ্যের লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের খারাপ মিটার টাকার অভাব দেখিয়ে পরিবর্তন করতে পারছে না, তারা কার স্বার্থে অনেক বেশি টাকা খরচ করে স্মার্ট মিটার কিনছে? এই স্মার্ট মিটার চালু হলে রাজ্যের ২৭ হাজার মিটার রিডারের চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা। গ্রাহকদেরও ক্ষতি। তাদের মোবাইলে শুধু টাকার পরিমাণ আর জমা দেওয়ার তারিখ আসবে, কত ইউনিট বিদ্যুৎ গ্রাহক খরচ করেছেন, তার রেট কত—এ সব কিছুই জানানো হবে না। এইভাবে গ্রাহকদের অন্ধকারে রেখে স্মার্ট মিটার বসালে বাস্তবে গ্রাহকরা কোম্পানির লুটের শিকারে পরিণত হবে। অ্যাবেকা রাজ্যের সমস্ত কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে গ্রাহকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন ও লাগাতার বিক্ষোভের কর্মসূচি নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (ডব্লুবিপিডিসি) উৎপাদনের খরচ ইউনিট প্রতি ৭০ পয়সা কমালেও গ্রাহদের জন্য বিদ্যুতের মাশুল কমানো হচ্ছে না। তিনি লেট পেমেন্ট সারচার্জ ব্যাঙ্ক রেটে নেওয়ার দাবি জানান। সংগঠন দাবি জানায়, কৃষিতে বিনামূল্যে ও গৃহস্থের জন্য ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গ্রাহকরা দাবি জানান, জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল-২০২২ প্রত্যাহার করতে হবে।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে
মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা অভিযান

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৯ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) ডাক দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা ঘেরাওয়ের। রাজধানী ভোপালের নানা দিক থেকে মিছিল করে বিধানসভা ঘেরাও করতে যান রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা সহস্রাধিক মানুষ। নীলম পার্কের কাছে পুলিশ তাঁদের আটকালে সমস্ত মিছিলের সমবেত বিক্ষোভকারীরা একযোগে নীলম পার্কেই বিক্ষোভ সভা শুরু করেন।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং বিক্ষোভ সভায় বলেন, মধ্যপ্রদেশে বিজেপি দীর্ঘদিন রাজত্ব করছে। কেন্দ্রেও তাদের সরকার। অথচ জনজীবনের একটি সমস্যারও তারা সমাধান করেনি, বরং দিন দিন তা বাড়ছে। উচ্চহারে ভ্যাট এবং অন্যান্য করের জন্য মধ্যপ্রদেশে পেট্রল-ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম বহু রাজ্যের থেকে বেশি। প্রতিদিন ৫ থেকে ৬ জন বেকার যুবক-যুবতী এই রাজ্যে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু সরকারি দপ্তরে হাজার হাজার পদ খালি। চাকরি নিয়ে দুর্নীতিতে মধ্যপ্রদেশ বোধহয় সবার ওপরে আছে। পেটের দায়ে রাজ্যের বিরাট সংখ্যক মানুষ অন্য রাজ্যে পাড়ি জমান। রাজ্যের ৩৭ শতাংশ চাষি দারিদ্র সীমার নীচে। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রামাবতার।

এমএসপি-র গ্যারান্টির দাবিতে আন্দোলনের ডাক হরিয়ানায়

কৃষকদের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ এমএসপি-র আইনি গ্যারান্টি, সমস্ত গরিব মানুষকে রেশনে অন্তর্ভুক্ত করা, বিপিএল কার্ড প্রদান, ১০ হাজার টাকা বার্ধক্য ভাতা, বিদ্যুৎ বিল-২২ বাতিল করা, শহর এবং গ্রামের গরিব মানুষের সারা বছর কাজের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবিতে হরিয়ানা জুড়ে আন্দোলন শুরু করেছে এআইকেকেএমএস।

২১ ফেব্রুয়ারি সংগঠন ডাক দিয়েছে রোহতকে জোনাল স্তরীয় ধরনার। রাজ্যের অন্যত্রও বড় শহরগুলিতে ধরনা নানা দিনে হবে। এই কর্মসূচির প্রচারে সমস্ত সবজি মাণ্ডি, গ্রাম, গঞ্জ ও শহরের দরিদ্র বস্তি এলাকায় স্লোগান দিয়ে, পোস্টার হাতে জাঠা করছেন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা। ছবিতে রোহতকের একটি প্রচার স্কোয়াড।

মদের প্রসার রোধের দাবিতে বিক্ষোভ

নারী নির্যাতন ও মদ-মাদকের প্রসার বন্ধ, আশা-আইসিডিএস-স্কিম ওয়ার্কারদের বাঁচার মতো মজুরি এবং তমলুকের রত্নালীতে মদের দোকান বন্ধের দাবিতে ৭ ফেব্রুয়ারি এআইএমএসএস-এর উদ্যোগে মানিকতলা রত্নালী থেকে মিছিল করে তিন শতাধিক মহিলা তমলুক থানায় বিক্ষোভ দেখান (ছবি)। তমলুক ছাড়াও জেলায় এগরা, কাঁথি প্রভৃতি জায়গায় মিছিল ও থানায় ডেপুটেশন কর্মসূচি হয়। তমলুক পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের রত্নালীতে চার বছর বন্ধ থাকার পর আবারও মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে গত নভেম্বর থেকে লাগাতার প্রতিবাদে নেমেছেন এলাকার বাসিন্দারা। ১০ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের বিরাশিতম দিনে এলাকার নাগরিকদের গড়ে তোলা মদ বিরোধী নাগরিক কমিটি এলাকায় পথসভা ও মিছিল সংগঠিত করে।

চাঁচোলে মিড ডে মিল কর্মীদের অবরোধ

৮ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের চাঁচোল-১ ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের মালদা জেলা সংগঠক সাথী চৌধুরী, স্থানীয় নেতৃত্ব উমা সরকার, সুফিয়া বিবি, নজরুল ইসলাম, মাজেদা বিবি প্রমুখ। মালতিপুর বাসস্ট্যান্ড মোড়ে পথ অবরোধ করে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন সাথী চৌধুরী।

মিছিল করে তাঁরা বিডিও দপ্তরে যান। সব মিড ডে মিল কর্মীকে পোশাক, উপযুক্ত বাসনপত্র ও সারা বছরই প্রতি মাসে ঠিকমতো বেতন দেওয়ার আশ্বাস দেন বিডিও। মিড ডে মিল কর্মীদের রান্না ছাড়া অন্য কাজ যাতে করানো না হয় সে বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করবেন বলে জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি মালদা জেলা সম্পাদক অংশুধর মণ্ডল।

যুদ্ধে লাভ শাসক, যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদেরই

বিশ্ব জুড়ে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি সহ অতি-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু বেতন-মজুরি বাড়াতে রাজি নয় সরকারি-বেসরকারি মালিকরা। এই অবস্থায় গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো এক বছর ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছেন দু দেশের সাধারণ মানুষ। যুদ্ধের অজুহাতে দুনিয়া জুড়ে খাদ্যপণ্যের দাম আরও চড়িয়ে দিচ্ছে একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা। এত ক্ষতি সত্ত্বেও কোনও পক্ষই কিন্তু রাজি নয় যুদ্ধ থামাতে।

নামে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ হলেও এই যুদ্ধ আসলে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী জোটের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাশিয়ার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধজোট 'ন্যাটো'-র ওপর চাপ রাখতে ইউক্রেনে হামলা জারি রেখেছে রাশিয়া। অন্য দিকে এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমেরিকা সহ ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা লাগাতার অস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে ইউক্রেনকে। যুদ্ধ অবসানের শান্তির শর্ত বারবার নানা অজুহাতে বানচাল করে দিতে সচেষ্ট তারা। ফলে চরম দুর্দশার শিকার হচ্ছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও অস্ত্র উৎপাদনকারী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের। তাই যুদ্ধের প্রতিটি দিন তাদের কাছে যেন উৎসবের খুশি বয়ে আনছে।

যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ ফ্রান্সে

গত ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধের শুরু থেকেই পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের মজুত খালি করে ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠাতে থাকে। মজুত ভাণ্ডার একটু খালি হতেই অস্ত্র উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে আবার নতুন অস্ত্র উৎপাদনের চুক্তি করছে তারা। ইউরোপের দেশগুলিকে ছাপিয়ে আমেরিকাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি অস্ত্র বিক্রি করেছে ইউক্রেনে। ২০২২-এর নভেম্বরের মধ্যে ১৮.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধাস্ত্র ইউক্রেনকে দিয়েছে তারা। পরের মাসেই তারা আরও ১.৮৫ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম দেওয়ার ঘোষণা করে, যার মধ্যে রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থা (টাইমস অব ইন্ডিয়া-১৫ জানুয়ারি)। সম্প্রতি ব্রিটেনের সাথে যুক্ত হয়ে ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ডও ইউক্রেনে ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে। জার্মানি ও স্পেন বিধ্বংসী লেপার্ড-২ ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে ইউক্রেনে। এর কোনওটাই বিনা পয়সায় নয়, সরাসরি বা ঘুরপথে এর জন্য বিপুল অর্থ ইউক্রেনের ঘাড় ধরেই আদায় করবে তারা। ইউরোপ এবং আমেরিকা ইউক্রেনে নিত্যনতুন সমরাস্ত্র পাঠানোর ফলে যুদ্ধ আরও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাজেট এ বছর সমস্ত পুরনো রেকর্ড ভেঙে দাঁড়াতে চলেছে ৮৫৮ বিলিয়ন ডলারে। ডলারের এই বিপুল অঙ্ক সুইজারল্যান্ড দেশটির জাতীয় আয়ের চেয়েও বেশি। এর মধ্যে কমপক্ষে ৮০০ মিলিয়ন ডলার শুধু ইউক্রেনকে সামরিক অস্ত্র জোগাতে চলে যাবে (টাইমস অব ইন্ডিয়া-১৫ জানুয়ারি, '২৩)। প্রতিরক্ষা-বিল থেকে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার অস্ত্র কোম্পানি লকহিড মার্টিন এবং জেনারেল ডায়নামিকস থেকে কেনা অস্ত্র ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ডনেৎস্কে যে মার্কিন হিমারস রকেট লঞ্চার ব্যবহার করেছে সেগুলি লকহিড মার্টিন কোম্পানিতে তৈরি। ফলে এ কথা পরিষ্কার যে, মার্কিন প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলির সময় ভাল যাচ্ছে। লকহিড মার্টিন কোম্পানির শেয়ারের দাম গত বছরের থেকে ১১ শতাংশ বেড়েছে, নর্থরপ গ্রুমান-এর বেড়েছে ২৩ শতাংশ এবং এয়ারো ভায়রনমেন্ট-এর ২১ শতাংশ।

এই যুদ্ধের ফলে শুধু অস্ত্র ব্যবসায় বিপুল লাভ হচ্ছে তাই নয়। দেখা যাচ্ছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে এই টালমাটাল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রীরাও নানা ভাবে লুট চালিয়েছেন, দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন। সেই দুর্নীতি এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, সম্প্রতি ইউক্রেনের বেশ কয়েকজন সরকারি কর্তা ও মন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ— যুদ্ধের টাকায় বিলাসবহুল জীবন যাপনের। আবার কেউ যুদ্ধ-পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে খাবার মজুত রেখে চড়া দামে তা বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ।

আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলি সহ বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই আজ ব্যাপক অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগছে। উৎপাদনের পরিমাণে ঘাটতি না থাকলেও কেনার ক্ষমতা নেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের। দেশে দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি আজ মন্দার ধাক্কায় টালমাটাল। এই অবস্থায় ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিকে কিছুটা চাঙ্গা করতে অস্ত্র-ব্যবসাই পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকদের একমাত্র ভরসা। তাই যুদ্ধ বাধানো এবং তা চালিয়ে যাওয়া তাদের জন্য একান্ত জরুরি। যুদ্ধের সময় সরকারের কাছ থেকে বিপুল অস্ত্রের বরাত পায় অস্ত্র কোম্পানিগুলি। অস্ত্র তৈরির কাঁচামাল, আনুষঙ্গিক পণ্যের কেনাবেচা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয়। অস্ত্র-ব্যবসায়ীদেরও চাহিদার সঙ্কটে ভুগতে হয় না। কারণ তাদের উৎপাদিত অস্ত্রের সবচেয়ে বড় খদ্দের খোদ দেশের সরকার। তা ছাড়া অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্ষোভ কমাতে তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেও যুদ্ধের জুড়ি নেই। আবার এই যুদ্ধই দেশের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সামনে লুটপাটের বিপুল সুযোগ খুলে দেয়।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব এইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও তাদের শাসক কর্পোরেট পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে বিরাট সুযোগ হিসাবে দেখা দিয়েছে। মরতে বসা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরও কিছুদিন টিকিয়ে রাখার অক্সিজেন হিসাবে এই দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছে তারা। তাই আমেরিকাই হোক বা ইউরোপের নানা দেশ— কোনও দেশের সরকারেরই এই যুদ্ধ বন্ধের কোনও সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না। মূল্যবৃদ্ধির আঁচে ঝলসে বেকারত্বের যন্ত্রণায় দীর্ণ হচ্ছেন বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। তাঁদের বাঁচানোর কোনও চেষ্টা না থাকলেও মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকে বাঁচাতে মরিয়া আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির যুদ্ধ-ব্যবসায়ী শাসকরা তাই আপাতত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শরণ নিয়েছে। এমনকি ভারতের মতো দেশও মুখে শান্তির কথা বলতে বলতেই কার্যত যুদ্ধের সুযোগটিকে দেশীয় কর্পোরেট পুঁজির মুনাফালুটের স্বার্থে নানা ভাবে ব্যবহার করছে। এই অবস্থায় দেশে দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে যুদ্ধের সমস্ত আঘাত বয়ে চলা শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষকেই।

পাঠকের মতামত

হিন্দুত্ববাদীদের মিথ্যাচার

বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই 'অত্যন্ত দায়িত্ববান' শাসক হিসেবে ইতিহাসের পুনর্লিখনে উদ্যোগী হয়েছেন। এমন ভাবে তারা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও গরিমা পুনরুদ্ধারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, যা দেখে মনে হতে পারে ভারতের জনগণ এতদিন যে ইতিহাস পড়ে এসেছিলেন তা সার্বৈব মিথ্যা! সে জন্যই নাকি তাদের এমন উদ্যোগ।

কিন্তু এই হিন্দুত্ববাদীদের ইতিহাস বা ইতিহাসের ধারণা জানলেন মানুষ আজ সহজেই বুঝতে পারবেন, প্রমাণহীন অন্ধস্তুতিবাক্যে তাদের জুড়ি মেলা ভার। হিন্দুদের ইতিহাস গৌরবান্বিত করার নামে তাদের আসল উদ্দেশ্য ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো।

এ ক্ষেত্রে তাদের নতুন সংযোজন, ভারতে মুসলিমদের আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা। এছাড়া মুসলিম শাসকদের দ্বারা হিন্দু দেবদেবী, মন্দির এবং দেবত্তর সম্পত্তি লুঠপাট এবং ধ্বংসের অভিযোগ। তাদের মতে, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং অত্যন্ত উন্নত সমাজ, সভ্যতা পতনের মূলে রয়েছে মুসলিম শাসকরা। তারা ভারতে এসে এখানকার হিন্দু শাসকদের সাম্রাজ্য শুধু ধ্বংস করেছে তাই নয়, বহু হিন্দু মন্দির এবং হিন্দু দেবতাদের মূর্তি ধ্বংস করে তাদের ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে কালিমালিপ্ত করেছে। মুঘল পূর্ববর্তী বহিঃআক্রমণকারী এবং শাসকদের মূর্তি ধ্বংসের ইতিহাস বাদ দিয়েও বিজেপি নিযুক্ত ইতিহাস লেখকরা বলছেন, শুধুমাত্র মুঘলরা ভারতবর্ষের প্রায় ৮৬ হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছেন। যদিও এই সংখ্যা নিয়ে তাদের দলের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। বিজেপি সরকারের কোনও মন্ত্রী কখনও বলছেন, এই সংখ্যা ৫০ হাজার, অন্য কেউ বলছেন ৩০ হাজার। তাদের বক্তব্য, মুঘল পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং লুটপাটের যে রীতিনীতি চালু করে গেছেন, সেটি অত্যন্ত সুচারু ভাবে পালন করে গেছেন তার পরবর্তী মুঘল শাসকরা।

প্রকৃত ইতিহাস কিন্তু বলছে অন্য কথা। ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটনের 'এসেস অন ইসলাম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি'-তে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদীরা যে হাজার হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কথা বলছেন তার কোনও ভিত্তি নেই। প্রামাণ্য নথি থেকে সুলতানি যুগে মোট ৮০টি হিন্দু মন্দির লুটপাট এবং ধ্বংসের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে, এই হিন্দু মন্দির লুটপাট ধ্বংসের শুরু হয় রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় ইন্দ্র- এর আমলে। দশম শতাব্দীর শুরুর দিকে তিনিই প্রথম কলাপ্রিয়ার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানকার সম্পত্তি লুটপাট করে নিজের সাম্রাজ্যে নিয়ে আসেন। প্রাক-আধুনিক যুগের ইতিহাস অনুযায়ী মন্দিরগুলি শুধুমাত্র আরাধনা গৃহ নয়, সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যের স্বাস্থ্য এবং ধনসম্পদের প্রতিমূর্তি হিসেবেও গণ্য হত। মন্দিরগুলিতে সেই সময় প্রচুর ধনসম্পদ রাখা হত। সেই ধন-সম্পদ লুটপাট করে নিজের সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রথম বাইরের আক্রমণকারীরা ভারত ভূখণ্ডে আসেন। তার প্রায় কয়েক শতাব্দী পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতানি শাসন।

ঐতিহাসিকরা বলছেন সোমনাথ মন্দির সহ যে যে মন্দির ধ্বংস হয়েছে, তা মুসলিম শাসকরা তখনই ধ্বংস করেছে, যখন সেই সাম্রাজ্যের শাসকরা শক্তিশালী হয়ে সুলতানি শাসন বা মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ইতিহাস বলছে, ধর্মীয় কারণে নয়, নিজেদের আধিপত্য এবং শক্তিশালী উপস্থিতি জানান দিতেই তৎকালীন মুসলিম শাসকরা কেউ কেউ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছেন। এই কথাগুলি বিজেপি নেতারা বলেন না। ক্রমাগত উস্কানি এবং অনৈতিক মিথ্যাচারের ফলে কিছু মানুষের মধ্যে এই মিথ্যা হিন্দুত্ববাদের ঝোঁক তৈরি করতে তাঁরা সফল হয়েছেন। যারই ফলে ধ্বংস হয় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ। দেশের মানুষ ভুলতে পারেননি সেই কলঙ্কিত দিন। ভুলতে পারেননি বহু দাঙ্গার ইতিহাস। ভারতবর্ষের মতো একটি দেশে যেখানে বহু ধরনের ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের বাস, সে দেশে এই মিথ্যা ইতিহাসের প্রচলন করতে চাইছে বিজেপি সরকার। যে ইতিহাস পড়ে সত্যিকারের ইতিহাস জানা তো দূর, সাধারণ মানুষের মনে জন্ম নেবে ধর্মীয় ঈর্ষা, প্রতিহিংসা। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। তারা এই মিথ্যাকে ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন ইতিহাসের পুনর্লিখনের মাধ্যমে। তারা তৈরি করতে চাইছেন এমন একদল মানুষ উদার, মানবিক দৃষ্টির বদলে যারা বহন করবে উগ্র হিন্দুত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

ভাস্বর হালদার
ছাত্র, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে এবার শিখদের ইতিহাসকে বিকৃত করছে বিজেপি

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে বিজেপি এবার হাতিয়ার করেছে শিখ ঐতিহ্যকে। শিখদের পালনীয় ‘সাহিবজাদে শহিদ দিবস’-এ র নাম পাল্টে দিনটিকে ‘বীর বাল দিবস’ (সাহসী শিশু দিবস) হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার।

১৬৯৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে শিখ ধর্মগুরু গোবিন্দ সিংহের দুই শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনা স্মরণ করে দিনটিকে শহিদ দিবস হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছেন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। গত বছর জানুয়ারি মাসে গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ ২৬ ডিসেম্বর দিনটি ‘বীর বাল দিবস’ হিসাবে পালন করার কথা ঘোষণা করেন। আপত্তি জানায় শিরোমণি গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটি কিংবা অকাল তখত-এর মতো শিখ সংগঠনগুলি। কিন্তু তাতে কান না দিয়ে গত ২৬ ডিসেম্বর মহা সমারোহে বীর বাল দিবস পালন করেছে বিজেপি। দিল্লির ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে এ উপলক্ষে দীর্ঘ ভাষণও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

হঠাৎ শিখদের ইতিহাসে হস্তক্ষেপ কেন? আসলে মুঘল শাসকদের হাতে শিখ ধর্মগুরুর দুই শিশুপুত্রের হত্যার ঘটনাটিকে বিজেপি তার চরিত্র অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক রঙ দিতে চায়। প্রধানমন্ত্রীর সেদিনের ভাষণেই সে কথা স্পষ্ট। কিন্তু ১৬৯৯-এর শিখ-মুঘল বিরোধের পিছনে আদৌ কি ধর্মের ভূমিকা ছিল?

কী বলছে ইতিহাস

১৬৯৯ সালে শিখ ধর্মগুরু গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুর সাহিবে প্রতিষ্ঠা করেন ‘খালসা’ নামক প্রতিষ্ঠান। সেখানে এই ধর্মগুরু একটি সেনাবাহিনী তৈরি করেছিলেন। সেই কারণে ‘খালসা’-কে বিপদ হিসাবে দেখেছিল পার্বত্য রাজ্যগুলির হিন্দু রাজারা। ১৭ শতাব্দীর শেষ দশকে এই পার্বত্য রাজ্যগুলির সঙ্গে শিখদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়, কিন্তু শিখরা কোনও মতেই আনন্দপুর সাহিব ছেড়ে যাননি। ইতিহাস বলছে, শিখদের পাশে নিজের অনুগত শিষ্যদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বদরুদ্দিন শাহ নামে এক মুসলমান পীর। শেষ পর্যন্ত খালসাকে বাগে আনতে পার্বত্য রাজারা মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছে সাহায্য চায়। ১৭০৪ সালে মুঘল শাসকদের সাহায্য নিয়ে বিলাসপুর ও হাণ্ডুরিয়ার দুই হিন্দু রাজা ভীমচাঁদ ও হরিচাঁদ আনন্দপুর সাহিবকে চারিদিক থেকে সেনা দিয়ে ঘিরে ফেলেন। আশপাশের আরও কয়েকটি রাজ্যও শিখদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যোগ দেয়। কয়েক মাস ধরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় আনন্দপুর সাহিবকে। শেষ পর্যন্ত হিন্দু রাজারা ও মুঘল সুবেদাররা শিখদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। চুক্তিতে শপথ করা হয় যে, গুরু গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুর সাহিব ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলে এই যুদ্ধ বন্ধ করা হবে। শিরোমণি গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির প্রকাশিত ইতিহাস অনুযায়ী, ১৭০৪-এর ২০ ডিসেম্বর গুরু গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুর সাহিব ত্যাগ করেন। কিন্তু শত্রুরা শপথ ভঙ্গ করে শিখদের উপর আক্রমণ চালায়। যুদ্ধে গুরু গোবিন্দ সিংহের বড় দুই পুত্রের মৃত্যু হয়। তাঁর ছোট দুই পুত্র এক হিন্দু রাঁধুনির বিশ্বাসঘাতকতায় মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক সুবেদারের হাতে প্রাণ হারান। ইতিহাস আরও বলে, গুরু গোবিন্দ সিংহের সঙ্গে শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও মুঘল সাম্রাজ্যেরই এক সেনাপতি নবাব শের মহম্মদ খান এই হত্যার বিরোধিতা করেছিলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের আরও এক রাজ্যপাল দেওয়া সুচা নন্দ নিজে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও শিশুদুটিকে হত্যা করার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

সামন্তী যুগে যুদ্ধ, লুঠতরাজ, হত্যার ক্ষেত্রে ধর্ম দেখা হত না

ফলে ইতিহাস সাক্ষী, গুরু গোবিন্দ সিংহের দুই শিশুপুত্রের হত্যার সঙ্গে ধর্মীয় বিরোধের কোনও সম্পর্কই নেই। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, সামন্তী যুগে সমস্ত রাজা-মহারাজারাই তলওয়ারের জোরে রাজ্য শাসন করেছেন। তাঁদের অনেকেই বহু যুদ্ধ করেছেন, নির্মম ভাবে বিদ্রোহ দমন সহ নানা জঘন্য অপরাধ করেছেন। বিরোধীরা কে কোন ধর্মের অনুসারী, এ সব ক্ষেত্রে তা কোনও বিচার্য বিষয়ই ছিল না। কয়েকজন অত্যাচারী মুসলমান শাসকের পাশাপাশি ইতিহাসে এমন সব হিন্দু রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায় যাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও নাস্তিকদের উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়েছেন। হিন্দু রাজারাও পরস্পরের মধ্যে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। শত্রু রাজার একই ধর্ম সেখানে কোনও বাধাই হয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শাসকদের লক্ষ্য ছিল হয় নিজেদের রাজত্বের সীমানা বাড়ানো, অথবা প্রজাদের উপর সর্বাত্মক আধিপত্য বিস্তার করা। শিখদের সঙ্গে মুঘলদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পিছনেও ছিল এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা।

মুসলমান বিদ্বেষ ছড়ানোই বিজেপির লক্ষ্য

কিন্তু মুসলমান বিদ্বেষের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে সামান্য সুযোগটুকুও হাতছাড়া করতে রাজি নয় বিজেপি। এই লক্ষ্য থেকেই তারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী মুঘলদের শত্রু হিসাবে খাড়া করে শিখ সংগঠনগুলির আপত্তি সত্ত্বেও শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের বিরোধের ঘটনায় ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার রঙ লাগাচ্ছে। এ দেশে নানা ধর্মের মানুষের সহাবস্থানের যে দীর্ঘ সংস্কৃতি রয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদ ছড়িয়ে তা নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে বিজেপি-আরএসএস। এরই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম মৌলবাদও শক্তি সঞ্চয় করছে। ইতিহাস বিকৃত করে বিজেপি-আরএসএস এই মুসলিম মৌলবাদ তথা মুসলিম সন্ত্রাসবাদের শিকড় হিসাবে বার বার মুঘল শাসকদের চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ‘সাহিবজাদে শহিদ দিবস’-এর নাম পাল্টানোর পিছনে রয়েছে সেই একই চাল। এবারই প্রথম নয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় মুঘল সম্রাট বাবরের নাম নিয়ে মুসলমানদের ভারতছাড়া করার নোংরা স্লোগান তুলেছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীবাহিনী। নানা অজুহাতে তারা বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে।

শিখ সম্প্রদায় বিজেপির ফাঁদে পা দিতে রাজি নয়

শিখ সম্প্রদায়ের দুই সংগঠন ঐতিহ্যবাহী ‘সাহিবজাদে শহিদ দিবস’-এর নাম পাল্টে ‘বীর বাল দিবস’ করার শুধু বিরুদ্ধতা করেছে তাই নয়, তারা সরাসরি অভিযোগ তুলেছে যে, বিজেপি সরকার শিখ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। কারণ, শিখ ঐতিহ্য অনুযায়ী গুরু গোবিন্দ সিংহের নিহত দুই পুত্রকে তাঁরা শিশু হিসাবে দেখেন না। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের তাঁরা ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করেন। ফলে এই দিনটিকে ‘সাহসী শিশু দিবস’ হিসাবে পালন করায় আপত্তি জানিয়েছেন শিখরা। তাছাড়া, বিজেপি-আরএসএসের উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে নিজেদের জড়াতে রাজি নন শিখরা। এর আগে বহু বার এই অপশক্তির আক্রমণের লক্ষ্য কাশ্মীরি মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়েছে শিখ সংগঠনগুলি।

মুসলমানরা যখন নয়া নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধতা করেছেন, শিখ সংগঠনগুলি এগিয়ে এসেছে তাঁদের সাহায্যার্থে। গুরগাঁওয়ে যখন মুসলমানদের শুক্রবারের নমাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, শিখরা নিজেদের গুরদোয়ারার দরজা খুলে দিয়েছিলেন তাঁদের ধর্মাচরণের জন্য। এই উদারবাদী মনোভাব আরএসএস-বিজেপির সহ্য হয় না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তারা শিখদের যুক্ত করে নিতে চায়। সেই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে শিখদের ঐতিহ্য বিকৃত করতেও তাদের বাধছে না।

এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে

কালা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লি সীমান্তের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে শিখ, মুসলমান, হিন্দু সহ সমস্ত ধর্মের মানুষ অংশ নিয়েছিলেন এবং বহু বাধা অতিক্রম করে দীর্ঘ ও লাগাতার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা ঐতিহাসিক জয় অর্জন করেছেন। এই জয় শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বুকে কাঁপন ধরিয়েছে। সেই কারণেই তারা জনস্বার্থবিরোধী সরকারি নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ঐক্যবদ্ধ জনগণের মধ্যে যে কোনও সুযোগে ভাঙন ধরাতে চাইছে। একই সঙ্গে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে বিজেপি সরকার প্রতি মুহূর্তে কোনও না কোনও সাম্প্রদায়িক ইস্যু খুঁচিয়ে তুলছে। ২৬ ডিসেম্বর দিনটিকে বীর বাল দিবস ঘোষণা করা তাদের সেই ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ।

বরাদ্দ কমানোর প্রতিবাদ মিড ডে মিল কর্মীদের

বেন্দ্রীয় বাজেটে মিড ডে মিল খাতে বরাদ্দ কমানোর প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, জনমুখী বাজেটের কথা বলা হলেও, মিড ডে মিল প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ১২০০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মিড ডে মিল প্রকল্পের খরচ বৃদ্ধি পায়। তার জন্য বরাদ্দও বৃদ্ধি করা দরকার।

মিড ডে মিলের খাবার যে কর্মীরা তৈরি করেন, সেই কর্মীদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বেতন মাসে মাত্র ১০০০ টাকা। তাও দেওয়া হয় বছরে ১০ মাস। ২০১২-র পর থেকে কেন্দ্র এদের বেতন বৃদ্ধি করেনি। এ রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন মাসে ১৫০০ টাকা। ২০১৩ সালের পর এক পয়সাও বাড়েনি। কিন্তু তামিলনাড়ুর মিড ডে মিল কর্মীরা পান মাসে ১০০৮৩ টাকা, কেরালায় পান ৯৫০০ টাকা, হরিয়ানায় পান ৭০০০ টাকা। শুধু তাই নয়, মিড ডে মিল কর্মীরা রান্না করলেও তাঁদের সেখান থেকে খাওয়ার কোনও আইনসঙ্গত অধিকার নেই।

মিড ডে-মিল প্রকল্পে বরাদ্দ কমানোর তীব্র বিরোধিতা করে এআইইউটিইউসি দাবি জানিয়েছে, ছাত্র-ছাত্রী সহ মিড ডে মিল কর্মীদের পুষ্টিকর খাবার ও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করতে হবে। কেন্দ্রীয় বাজেটে মিড ডে-মিল প্রকল্পের বরাদ্দ কমানোর প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড

এসপ্ল্যানেডে বাজেটের প্রতিলিপিতে আগুন

ডে-মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু করে লেনিন সরণির মোড় অবরোধ করে বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। অগ্নি সংযোগ করেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পণ্ডা। ওই দিন রাজ্যপালের দপ্তরেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সনাতন দাস, রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পণ্ডা ও শিবানী মজুমদার।

পথিকৃৎ
ফেব্রুয়ারি ২০২৩
● মানুষের উদ্ভব ও বিবর্তন
● যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বিদ্যাসাগর
● ভারতে ভাববাদী দর্শনের উদ্ভব ও উৎস
● ফাতিমা শেখ-এর অনন্য জীবন
● গ্রন্থ পর্যালোচনা ● ৫টি ছোটগল্প

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

কমিউনিজমের ‘ভূত’ তাড়া করেছে মার্কিন শাসকদেরও

‘ইউরোপকে তাড়িয়ে ফিরছে এক ভূত— কমিউনিজমের ভূত ... কমিউনিস্ট বিপ্লবের আঘাতে কেঁপে উঠুক শাসক শ্রেণিগুলো ..!’ — কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, ১৮৪৮।

সেই ‘ভূত’ এবার আমেরিকাকে তাড়া করছে ..!

মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে মিয়ামির রিপাবলিকান দলের প্রতিনিধি মারিয়া এলভিরা সালাজার সম্প্রতি তাঁদের দেশ সম্পর্কে এক ‘আতঙ্কজনক’ সত্য স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন,

“আমেরিকার তরুণ প্রজন্ম বিশ্বাস করে, আমেরিকার সমস্ত নাগরিকের বৃহত্তর স্বার্থে সমাজতন্ত্র হল একটি উপযুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো। এই শতকের ৪০ শতাংশ মানুষ এবং ‘জেড’ প্রজন্ম (অর্থাৎ তরুণরা) মনে করেন, প্রখ্যাত টমাস জেফারসনের লেখা আমেরিকার ‘স্বাধীনতার সনদ’-এর চেয়ে মার্ক্স-এঙ্গেলসের ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’তে স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণাকে অনেক ভালো ও কার্যকরীভাবে তুলে ধরা হয়েছে...”।

বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের দাবি

এ আই ডি ওয়াই ও-র

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে স্কুলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির কথা আদালতে স্বীকার করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এই প্রসঙ্গে এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল ৯ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে এবং আদালতের সদর্থক পদক্ষেপের ফলে এসএসসি-র চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ভয়াবহ দুর্নীতির কথা কবুল করতে বাধ্য হয়েছেন।

তিনি বলেন, ৯৫২ জনের মধ্যে ৮০০ জনের চাকরি বাতিলের পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে কমিশন। ৮৪ শতাংশ চাকরি বাতিল, দুর্নীতির ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকেই প্রমাণ করল। কিন্তু যাদের লড়াই ও আন্দোলনে আজ এই নির্দেশ, তারা দীর্ঘ ৭০০ দিন রাস্তায় বসে। এদের ন্যায্য চাকরি আজও অধরা। নিয়োগের এই ব্যাপক দুর্নীতির দায় তৃণমূল সরকারেরও। তাই দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তির পাশাপাশি বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা সরকার ও কমিশনকে করতে হবে।

রঘুনাথপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রে ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের দাবিতে বিক্ষোভ

স্থায়ী কাজে নিযুক্ত ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ ও সম কাজে সম বেতন প্রদান, প্রতি বছর পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে ঠিকা শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধ করা, অভিজ্ঞতার নিরিখে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পদোন্নতি, ই এস আই-এর যথার্থ রূপায়ণ সহ ৯ দফা দাবিতে ৯ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (ডি ভি সি) কন্ট্রাক্টরস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্ল্যান্ট গেটে সারাদিনব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ সংঘটিত হয়।

বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ী কাজে নিযুক্ত ৪০০-র বেশি শ্রমিক-কর্মচারী এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া পাওয়ারমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমর সিনহা, পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক ও ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড প্রবীর মাহাতো, জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড নবনী চক্রবর্তী এবং ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড চিন্ময় ব্যানার্জী।

কমরেড সমর সিনহার নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল থার্মাল প্ল্যান্টের হেড অফ দ্যা প্রজেক্টের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অবিলম্বে দাবিগুলির মীমাংসা না হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন।

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার রাসবিহারী মোড়ে ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর উদ্ধৃতি প্রদর্শনী ও বুকস্টল হয়

কলকাতা মেডিকেল কলেজে বন্ধ কিডনির চিকিৎসা

বিক্ষোভ চিকিৎসক-স্বাস্থ্য কর্মীদের

কলকাতার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কিডনির চিকিৎসা (নেফ্রোলজি) বিভাগের একমাত্র শিক্ষক চিকিৎসককে রাজ্য সরকার বদলি করে দেওয়ার ফলে ওই হাসপাতালে কিডনির চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল কলেজেরই এই অবস্থা হলে জেলা স্তরের ভয়াবহ অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। মেডিকেলে কিডনির চিকিৎসায় অচলাবস্থা কাটানোর দাবিতে ৯ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালের সামানে বিক্ষোভ দেখায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার। প্রিন্সিপ্যাল ও সুপারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মেডিকেল কলেজের ইমারজেন্সি গেট থেকে প্রিন্সিপ্যাল অফিস পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, কলকাতা জেলা সম্পাদক ডাঃ নীলরতন নাইয়া, জেলা সহ-সভাপতি সিস্টার উন্নতি সাহা প্রমুখ। বিক্ষোভে বহু রোগীর পরিজনরাও যোগ দেন। তাঁরা এই হাসপাতালের নানা খামতির কথা তুলে ধরেন। চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি রোগী ও তাদের পরিজনরাও আন্দোলনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। অবিলম্বে কিডনির চিকিৎসা শুরু করা, সমস্ত স্পেশালিটি ও সুপার-স্পেশালিটি বিভাগে ডাক্তার নিয়োগ সহ সার্বিক পরিকাঠামো বজায় রাখার দাবি জানানো হয়। দাবি ওঠে প্রমোশন ও বদলি নীতির স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।

প্রিন্সিপাল সমস্ত দাবির যৌক্তিকতা মেনেও তাঁর নিজের অসহায়তার কথা ব্যক্ত করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানকেও যে আমলাতন্ত্রের গেরোয় বেঁধে রাজ্য সরকার ঠুঁটো করে রেখেছে তা তিনি কার্যত স্বীকার করে নেন।

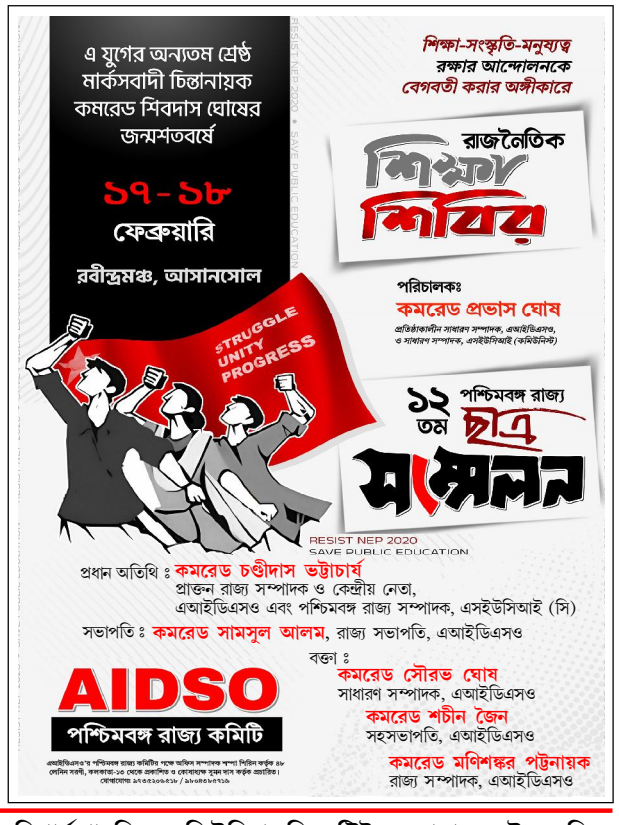

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com